সমুদ্র সম্পদে চট্টগ্রামঃ অর্থনৈতিক ব্যবহারে সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম*

ভূমিকা

ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান (geo-strategic postion) বিচারে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রাম রয়েছে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। এছাড়াও চট্টগ্রামের রয়েছে প্রাচীন ও বহুমুখী সম্ভাবনাময় একটি সমুদ্র-বন্দর এবং গভীর-সমুদ্র-বন্দর প্রতিষ্ঠার বাড়তি সুবিধা। চট্টগ্রামের অনন্য বৈশিষ্ট্য এর সমগ্র পশ্চিম উপকুল জুড়ে সমুদ্রের বিশাল বিস্তার। সমুদ্র চট্টগ্রামকে শুধু সৌন্দর্য মন্ডিত করেনি। একে করেছে সম্পদশালীও। সমুদ্র-বন্দরের জন্যই প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামের এত সমাদর। একে বলা হতো "প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার" (gateway to the East)। চট্টগ্রামে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বশেষ কন্সাল চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সম্ভাবনা সিঙ্গাপুরের চেয়ে হাজারো গুন বেশী। এছাড়াও বেশ কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত ব্যক্তি চট্টগ্রাম এসে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন যে, " নতুন সৃষ্টির ঐতিহ্য রক্ষা করে চট্টগ্রাম হয়তো একদিন সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে"। গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বিবেচনায় নিলে তাঁর এ আশাবাদ ইতিমধ্যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

ক্রমিক অবহেলার কারণে এক সময়কার " প্রাচ্যের রাণী " খ্যাত চট্টগ্রাম কতক ক্ষেত্রে রূপকথায় বর্ণিত "ঘুঁটে কুড়ানিতে" পরিণত হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকা এখনও এ দেশের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দর এখনও পর্যন্ত চট্টগ্রাম তথা সারা দেশের সর্বাধিক সম্ভাবনাময় কৌশলগত সম্পদ । ১৯৯৪ এ জাইকা পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে চট্টগ্রাম বিভাগের ও চট্টগ্রাম পৌর এলাকার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের জাতীয় গড় মাথাপিছু আয়ের যথাক্রমে ১.২২ ও ১.৪৯ গুন।

ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি

চট্টগ্রাম বন্দরের লিপিবদ্ধ ইতিহাস খ্রীষ্ট জন্মের ৪০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রাম পরিচিত ছিল "সেতগাং" (Shetgang) নামে। এটি একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ

---

* লেখক একজন সমাজকর্মী, কলাম লেখক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের সাবেক গবেষণা কর্মী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ১৯৭৬-৭৯ কর তদন্ত কমিশনের সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা।

"গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ" । ইতিহাস বলে, এই প্রাচীন সমুদ্র -বন্দরের মাধ্যমে প্রচুন পণ্য আনা-নেয়া হতো এবং এখানে বাণিজ্য বহর আসতো মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং বিভিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের বন্দর হতে । ওমান এবং ইয়েমেন হতে বণিকরা আসতে শুরু করে নবম শতক থেকে । ষোড়শ শতাব্দীতে আসে পর্তুগীজরা । চট্টগ্রাম বন্দরের তারা নামকরণ করে "Porte Grande" বা Grand Port" । বর্তমান অবস্থানে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে ১৮৮৭ সালে । ১৯১০ সালে ছিল এর বাৎসরিক ৫ লাখ টন পন্য খালাস (Handling) ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি জেটি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ছিল এই অঞ্চলের মিত্র শক্তির প্রধান সৈন্য ও অস্ত্র অবতরণ ক্ষেত্র (dumping station) । বছর আটেক আগে বিবিসির এক অনুষ্ঠানে দেখানো হয় চট্টগ্রাম বন্দরে আনীত অস্ত্র মায়ানমারের (তৎকালীন বার্মা) মধ্য দিয়ে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সরবরাহের জন্য যে রাস্তা ব্যবহৃত হতো তার বর্তমান চিত্র । ১৯৮৮ হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনার যৌথ দায়িত্বভার অর্পিত ছিল Port Commissioners I Port Railway -র উপর । দ্বৈত প্রশাসন পরিহারের উদ্দেশ্য ১৯৬০ এর জুলাই মাসে Port Trust এর উৎপত্তি । স্বাধীনতা উত্তর কালে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের বৃহত্তর উপযোগিতা ও দ্রুততর উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৭৬ সালে চিটাগং পোর্ট অথরিটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় । এবং তখন থেকে এ যাবত একজন চেয়ারম্যান ও অপর ৪ সদস্য বিশিষ্ট চিটাগাং পোর্ট অথরিটি (CPA) চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ বা শিপিং মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সিপিএ একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান । বাৎসরিক ১২ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সিপিএ নৌ মন্ত্রানালয়ের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে করতে পারে । ১৯১০ সালে যেখানে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটির সংখ্যা ছিল ৪টি ও পণ্য খালাস ক্ষমতা বাৎসরিক ৫ লাখ টান বর্তমানে বার্থ ও মুরিং-এর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে (অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য ১৯টি সহ) সর্বমোট ৫১টি ও পণ্য খালাস ক্ষমতা (অভ্যন্তরীন ৩০ লক্ষ টন সহ) সর্বমোট ২ কোটি ৮০ লাখ টন । ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের কর-পূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩৩০.১৩ কোটি টাকা । নির্মাণাধীন নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (সেপ্টেম্বর, ২০০৬এ যার যাত্রা শুরু প্রত্যাশিত) বন্দরের পন্য খালাস ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে উল্লেখ যোগ্য ভাবে । একটি সূত্র মতে, বর্তমানে বাস্তবায়াধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ২০১৫সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্য খালাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে চট্টগ্রাম বন্দর ।

চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা

এক কথায় বন্দরের সমস্যা হলোঃ শ্রমিক রাজনীতি, দূর্নীতি, অদক্ষতা, জাহাজ জট, পণ্য স্তুপীকরণ, পন্য চুরি বা খোয়া যাওয়া ইত্যাদি । স্বাধীনতার পর যতগুলো সরকার এসেছে কম-বেশী সবাই বন্দর শ্রমিকদের ভোট-বাক্স এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উপায়-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে এবং নিজ দলীয় লোকদেরকে বন্দর শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে বসিয়েছে । বর্তমানেও দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যানারে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসারী শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন রয়েছে । সময়-ক্ষেপন ইত্যাদি অনেক কারণে অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের (অন্যতম) প্রধান ব্যয়বহুল সমুদ্র বন্দর হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন । আবার অনেক আমদানীকারক শুল্ক-হার বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কারণে বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহ নেয়ায় বিরত থাকেন যা বন্দরে 'জট' সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ । পূর্বের মতো কথায় কথায় ধর্মঘট ডাকা না হলেও নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্প্রতি উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে । বর্তমান বিশ্বায়নের প্রবণতায় বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তথাকথিত

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কাম্য এবং শ্রমিকদের অযৌক্তিক দাবীর মুখে কিছুটা কাঙ্খিত হলেও দক্ষ পরিচালনার নামে বিশেষ শ্রেনী বা কোটারী স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিসর্জন কতখানি যুক্তিসংগত তাও বিবেচ্য। এ যেন অনেকটা মাথা-ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো। যুগপৎ জনস্বার্থ রক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যে যে সার্বিক সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন তার উপযুক্ত প্রচেষ্টার অভাব বন্দরের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের অপরাপর অর্থনৈতিক উদ্যোগ বা ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দেশ প্রেম, সুনীতি ও সততার অভাব প্রকট। দেউলিয়া রাজনীতিও এর জন্য বড়ো পরিসরে দায়ী। এ ব্যাপারে পরবর্তী পর্যায়ে আরও আলেচনা করা হবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচারে। এক কেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান সমস্যা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিলম্ব আর রাজনীতি ও প্রশাসন উভয়ই যখন দূনীর্তিগ্রস্ত হয় রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক স্বৈরাচার দ্রুত পরস্পর সহায়ক হয়ে উঠে যা বন্দরের মত একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে মন্দভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এটি চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষেত্রেও সত্য। অথচ চট্টগ্রাম বন্দরের রয়েছে প্রায় অপরিসীম সম্ভাবনা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো কেবল নয়, দূরবর্তী নেপাল, ভুটান, এমনকি চীনের বা তিব্বতের দুর্গম এলাকাগুলোকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারলে তা এদেশের অর্থনৈতিক উল্লম্ফনে (economic take-off) একটি সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে। আর সেই সাথে এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে যদি আমরা মধ্য এশিয়ার সিল্ক রুটের সাথে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারি তাহলেতো সোনায় সোহাগা। এশিয়ার প্রায় পুরো মূল ভুখন্ডকে তখন দেয়া যেতে পারে চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা। ২৫ জুলাই, ২০০৫ইং তারিখে প্রথম আলোয় এসেছে, সম্প্রতি চীনের কুনমিং (ইউনান প্রদেশের রাজধানী) চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের জন্য সড়ক সংযোগ চেয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চীন অনেক আগে থেকেই তার কৌশলগত সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। চীনের আন্তঃসীমান্ত মহাসড়ক ভারতীয় উপ-মহাদেশে তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৫ সালে চীন তিব্বতের লাসা ও নেপালের কাঠমুন্ডুর মধ্যে বাস চলাচল শুরু করেছে। নিয়েছে রেলপথ সম্প্রসারনের উদ্যেগও। একসময় দেখা যাবে ত্রিদেশীয় চুক্তির মাধ্যমে এই সড়ক ও রেল যোগাযোগ উত্তর ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও চীন গিলগিট ও কাশগরের মধ্যে নতুন পরিবহন সংযোগ স্থাপনের ঘোষনা দিয়েছে। বিপরীতে তথাকথিত নিরাপত্তার কথা বলে যেমন আমরা নব্বই-এর দশকে নিখরচায় সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের সংযোগ না নিয়ে (বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মতে যা আমাদের সমুদ্র-সীমার মধ্য দিয়ে ভারতে গেছে) এখন প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ নিচ্ছি তেমনি কার্যত ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা না দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এশিয়ান হাইওয়ে হতে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছি। আমাদের জন্যে সুবিধাজনক যে রুটটা- মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত চীনে পৌঁছানো- তাতে মায়ানমার, চীন বা থাইল্যান্ড কাউকেই আমরা আমাদের পক্ষে টানতে পারিনি। আমাদের প্রচেষ্টা শুরু করেছি আমরা অনেক দেরীতে, যদিও এশিয়ান হাইওয়ের প্রস্তাবনা সেই ষাটের দশক হতে। এদিক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের যে সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবছি তার রূপায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা তা এদেশে প্রকটভাবে অনুপস্থিত। অথচ চট্টগ্রামকে মুক্ত-বন্দরে পরিণত করার বিষয়টি নিয়েও আমরা ভাবতে পারতাম। পাকিস্তান আমল থেকে আমরা যে গভীর সমুদ্র-বন্দরের কথা শুনে আসছি তা এখনও সম্ভাব্যতা জরীপের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ ইতোমধ্যে মায়ানমার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ও থাইল্যান্ড আন্দামানের কাছে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছে। কিছুদিন আগে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় একটি উদ্বেগজনক খবর এসেছিল। সেটি হলো, মায়ানমার ও ভারত কোনাকুনিভাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমার (যা উপকূল হতে দক্ষিণে

সোজাসুজি ২০০ নটিকাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রায় অর্ধেক নিজেদের সমুদ্র সীমার মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। একটি নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে ভারত ও মায়ানমারের প্রকাশিত ম্যাপের বিরোধিতা না করলে বাংলাদেশকে তার সমুদ্র-সীমার অর্ধেকটাই চিরতরে হারাতে হতে পারে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং প্রশাসনিক সততা ও নিষ্ঠার অভাবের এ এক উৎকট দৃষ্টান্ত। যে কোন বন্দরের সাফল্যের জন্যে এ যুগে যা প্রথমেই প্রয়োজন তা হলো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে যে পরিমাণ কন্টেইনার বয়ে নিয়ে আসে প্রায় সে পরিমাণ কন্টেইনার যাতে তারা ফিরতিতে নিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা। কাজেই চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণের তথা চীনের মতো আমাদের ভূ-কৌশলগত সুবিধাকে অর্থনৈতিক সুবিধায় রূপান্তর করার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, প্রতিবেশী বা দূরবর্তী দেশকে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার-সুবিধা দেয়ার জন্যে সমর্থক রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে, এই বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

অপরাপর সমুদ্র-সম্ভাবনা

সমুদ্র বায়ু চট্টগ্রামের আবহাওয়াকে করেছে চমৎকার। সমুদ্র না থাকলে হয়তো উষ্ণ মন্ডলীর এ এলাকা হয়ে পড়তো উষর মরুময়। সমুদ্র আমাদের দিচ্ছে অনেক। মাছ, লবণ, শুটকি থেকে শুরু করে মুক্তা পর্যন্ত। কিন্তু সমুদ্রের সুবিশাল সম্পদ-সম্ভারের তুলনায় এ অতি যৎসামান্য। শুধু চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশ

এক ঘন মাইল সমুদ্র জলে মিশ্রিত খনিজের আনুমানিক পরিমাণ

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ (টন)
০১.	সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ)	১২,৮০,০০,০০০
০২.	ম্যগনেসিয়াম ক্লোরাইড	১,৭৯,০০,০০০
০৩.	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৭৮,০০,০০০
০৪.	ক্যালসিয়াম সালফেট	৫৯,০০,০০০
০৫.	পটাশিয়াম সালফেট	৪০,০০,০০০
০৬.	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুন)	৫,৭৮,৮৩২
০৭.	ম্যগনেসিয়াম ব্রোমাইড	৩,৫০,০০০
০৮.	ব্রোমাইন	৩,০০,০০০
০৯.	ষ্ট্রনটিয়াম	৬০,০০০
১০.	বোরোন	২১,০০০
১১.	ফ্লুওরিন	৬,৪০০
১২.	বেরিয়াম	৯০০
১৩.	আয়োডিন	১০০ হতে ১২০০
১৪.	আর্সেনিক	৫০ হতে ৩৫০
১৫.	রুবিডিয়াম	২০০
১৬.	রূপা	৪৫ টন পর্যন্ত
১৭.	সোনা	২৫ টন পর্যন্ত
১৮.	ইউরেনিয়াম	৭ টন
১৯.	তামা, সীসা, ম্যাঙ্গানীজ ও দস্তা	১০ হতে ৩০ টন

নয়, সারা বিশ্বের জন্যে সমুদ্র এক অফুরন্ত সম্পদ-ভান্ডার, যার খুব কমই মানুষ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জোয়ার-ভাটার অবিশ্রান্ত নিয়মে সমুদ্রই জীবনের মৌল উপাদানগুলো পৌছেঁ দিচ্ছে স্থলভাগে। মানুষের অস্তিত্বের জন্যে মহাশূণ্য (outer space)- এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই অন্তর্গত শূণ্য (inner space)। সমুদ্র-সম্পদের সঠিক আবিষ্কার ও ব্যবহার একদিন ভূ-গোলকে ম্যালথাসীয় তত্ত্বকে ভূল প্রমাণিত করবে অনায়সে। ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্টের অংশগ্রহন মিত্র শক্তির জয়লাভের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ জয়ের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে জার্মানীর পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমুদ্রজল হতে ম্যাগনেসিয়াম তৈরীর প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার। সমুদ্রের পানি থেকে নিষ্কাশিত ধাতব ম্যাগনেসিয়াম বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয় আগুনে-বোমা ও আলো -প্রভা সৃষ্টিকারী বোমা বানানোর জন্যে। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রের পানি থেকে আহরণ করছে ম্যাগনেসিয়াম ও ব্রোমাইন। দশ লাখ পাউন্ড পরিমাণ সমুদ্রজলে মিশে থাকে প্রায় এক হাজার পাউন্ড ম্যাগনেসিয়াম। মোটামুটিভাবে এক ঘন মাইল পরিমাণ সমুদ্রের পানি পরিশোধন করে পাওয়া যেতে পারে নিু ছকে উল্লেখিত খনিজ দ্রব্য গুলো।

এক ঘন মাইল বিরাট ব্যাপার। মোটামুটিভাবে ২৬ মাইল দীর্ঘ, ১০ মাইল প্রশস্ত ও ৩.৩ ফ্যাদম বা ১৯.৮ ফুট গভীরে পরিসরে যে পরিমাণ পানি ধরে তাকেই বলা যেতে পারে এক ঘন মাইল পরিমাণ পানি। উপরে বর্ণিত তালিকার প্রথম ৫টি আইটেম দেখলেই বোঝা যাবে কি বিপুল পরিমাণ ধাতব পদার্থ সমুদ্র জলে মিশে আছে। মহেশখালি ও কক্সবাজার উপকুলে কেবল সাধারন লবণ তৈরী করছি আমরা। তাও আবার মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তিতে। আর কিছু না হোক অন্ততঃ মিঠা পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের অচিরেই হাত বাড়াতে হবে সমুদ্রের দিকে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের কেবল রপ্তানী বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণ এলাকাতেই রয়েছে প্রায় সোয়াশ'র মতো গভীর নলকূপ যা আশ-পাশের এলাকায় প্রচন্ড পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গভীর নলকূপ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় যে সামগ্রিক বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার সাথে আরও কিছু যোগ করে পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র জল পরিশোধনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরে পর্যাপ্ত পানি সরবারহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সমুদ্র নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে। এক সময় গাওয়া হতো Rule Britania, Rule the Waves। তারও অনেক আগে প্রাচীন মিশরীয়, ফিনিশীয়, স্ক্যানডিনেভীয়, ভারতীয়, চীনা ও আরবীয়রা সমুদ্র পথে দেশে দেশে পণ্য ও জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চার করেছে। যে শূণ্য বা 'জিরো' আবিস্কৃত না হলে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেকাংশে 'জিরো' হয়ে যেত তা যুগপৎ স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিল প্রাচীন ভারতীয় ও রেড ইন্ডিয়ানরা। প্রাচীন আরবীয়রা 'জিরো'র ধারণা ইউরোপ নিয়ে গেলে প্রথমে তারা তা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। (রোমান সংখ্যায় এখনও শূণ্যের ব্যবহার নেই)। সমুদ্র পথে ভারতে আসার উপায় আবিষ্কারের নেশায় আমেরিকার সুবিশাল 'নতুন ভুবন' আবিস্কৃত হয়েছে এবং শেষাবধি ইউরোপ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে। এখনও যে জাতি যত বেশী সমুদ্রচারী তথা সমুদ্র-সম্পদ আহরণে অগ্রণী সে জাতি তত বেশী সম্পদশালী ও পরাক্রমশালী। এক সময় বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের লোকদের জাহাজী হিসাবে বেশ সুনাম ছিল। চট্টগ্রামের হালিশহরে তৈরী হতো কাঠ নির্মিত পালতোলা সমুদ্রগামী জাহাজ, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো 'শরের জাহাজ'। জাহাজ তৈরীর 'অর্ডার' আসতো ইউরোপ-আমেরিকাসহ সারা দুনিয়া থেকে। আমরা ভুলে গেলেও ইউরোপের অনেক স্থানে এখনও চট্টগ্রামের তৈরী কাঠের জাহাজ ভাসমান যাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। চট্টগ্রামের স্থানীয় অনেকেরও ছিল এ ধরনের সওদাগরী জাহাজের মালিকানা যে গুলো ইউরোপ পর্যন্ত যেতো বাণিজ্য-সওদা নিয়ে। আরবীয়দের হাতে যেমন সমুদ্র-বিদ্যার পরিপুষ্টি-লাভ ঘটে তাদেঁর উৎসাহেই

তৎকালে চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মান শিল্প বিকাশিত হয়। হালিশহরের ঈশান মিস্ত্রির হাট যাঁর নামে সেই ঈশান মিস্ত্রি ছিলেন একজন নামকরা শরের জাহাজা নির্মাতা। কালের চক্রে ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর লোহার পাত নির্মিত জাহাজের প্রচলন শুরু হলে পৃষ্ঠপোষকতায় অভাবে ও নবতর প্রযুক্তি লাভের ব্যর্থতায় চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মান শিল্প পরিবর্তিত পরিসরে বিকাশ লাভের পরিবর্তে মূখ থুবড়ে পড়ে। একই প্রযুক্তি হস্থান্তরজনিত কারণে চট্টগ্রামের জাহাজীরাও তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় পিছিয়ে পড়ে। হালিশহরস্থ নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও পরিপোষনের মাধ্যমে অসংখ্য বেকারের হাতকে আমরা সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত করতে পারি শুধু সমুদ্র জয়ের মাধ্যমে। সমুদ্র-সম্পদের রয়েছে আরও বহুতর সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম সহ সারা দেশের উপকুল জুড়ে যদি উপকুল রক্ষা বাঁধের সাথে সাথে তার উপরে তৈরী করা যেতো সড়ক নেটওয়ার্ক তাহলে সমুদ্র-সম্পদের বর্ধিত অর্থনৈতিক ব্যবহার তথা সমুদ্র-নির্ভর শিল্প ও পেশার বিকাশ ঘটিয়ে সারা দেশে সৃষ্টি করা যেতো (অর্থনৈতিক) উত্তরণের এক সুবিশাল, সুবর্ন সম্ভাবনা। শুধু মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুটকি বা লবণ তৈরী, মাছের ঘের, জাহাজ-ভাঙ্গা বা জাহাজ নির্মাণ শিল্প নয়, সমুদ্রের শামুক-গুগলি থেকে শুরু করে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ (যা কয়েকশ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে) রপ্তানির মাধ্যমে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারি। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ইস্পাতের প্রধান যোগানদাতা জাহাজভাঙ্গা শিল্প বিকাশ লাভ করেছে একমাত্র চট্টগ্রামেই। আবার এই শিল্পে বিনিয়োগ হতে উদ্ভুত লাভ পুনঃ বিনিয়োগ করে গড়ে তোলা হয়েছে ঢেউ টিন, সয়াবীন তেলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প। চট্টগ্রাম বন্দর বছরে যে পরিমাণ কর-পূর্ব মূনাফা অর্জন করে থাকে জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প হতে প্রায় সমপরিমান রাজস্ব আয় করে থাকে সরকার। দেশের অপরাপর শিল্পের তুলনায় সর্বাধিক সংযোগ-সম্পর্ক (Linkage effect) বিশিষ্ট এই শিল্প কিন্তু অদ্যাবধি শিল্প হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পায়নি। আমাদের মানব-সম্পদকে সমুদ্র নির্ভর শিল্পে নিয়োগ করে আমরা আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টিকরতে পারি। সমুদ্রের উদ্ভিদ এতই পুষ্টিকর যে তা আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সমাধানে বিরাট ভুমিকা রাখতে পারে। কক্সবাজারের ' পিংক পার্ল' বা গোলাপী মুক্তা ইতিহাস খ্যাত। সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম, ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে কক্সবাজারের গোলাপী মুক্তার কথা উল্লেখ করে গেছেন। কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফের উপকূল জুড়ে মুক্তার চাষ করে ফি বছর কেবল তা থেকেই ১০০ কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। আর কক্সবাজারের আকরিক বালিতো রয়েছেই। অথচ মহেশখালির অদূরে পরিকল্পিত গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে শুরু করে কক্সবাজারের বেলাভুমি হতে আকরিক বালি আহরণ এখনও কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আমাদের সমুদ্র তলদেশে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের (সম্ভাব্য) বিপুল আধার। বলা হয়ে থাকে পুরো চট্টগ্রামই তেল ও গ্যাসের উপর ভাসছে। আর আমরা যদি সমুদ্র তরঙ্গের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি তবে তা হবে আমাদের জন্যে অফুরন্ত শক্তির উৎস। প্রস্তাবিত সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সাথে যদি দূরবর্তী দ্বীপগুলোর সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলে পর্যটন শিল্পেরও প্রভূত প্রসার ঘটবে। মোদ্দা কথা, পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র-সম্পদ ও শক্তির সদ্ব্যবহার আমাদের অর্থনীতিতে আনতে পারে এক যুগান্তকারী বিপ্লব।

সমস্যা

কান টানলে মাথা আসার মতো সম্ভাবনার সাথে জড়িয়ে আছে নানাবিধ সমস্যাও যেগুলো আবার সামগ্রিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সাথেও জড়িত। বায়ু-নিরোধক পৃথকীকরণ (air-tight

division) সম্ভব না হলেও প্রধান কিছু সমস্যার প্রতীকি উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এগুলো হলোঃ

১. জনসংখ্যা বিস্ফোরন, দারিদ্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, মাদক, ও মাফিয়া বা সিন্ডিকেট বাণিজ্যের প্রসার, সামাজিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রভাব ইত্যাদি।

২. অর্থনৈতিক পণ্য ও সেবার অর্থনৈতিক মূল্য ও প্রচলিত মূল্যের মধ্যে বিদ্যমান বিপুল পার্থক্য।

৩. দূনীতি, অদক্ষতা, অপচয় ও অদূরদর্শিতা; প্রজ্ঞা, সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব; রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমন্বয় হীনতা।

৪. অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা।

৫. শাসককুলের অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা ও নীতিহীনতা।

৬. প্রায় সকল আদর্শিক আন্দোলনের হোতা ও নেতারুপ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হওয়া।

৭. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাইরের চাপ ও স্বার্থান্ধতা।

৮. অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বন্টন; বিশেষ গোষ্টি বা শ্রেণীর হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ; শোষন ও বঞ্চনা ইত্যাদি।

এসব সমস্যার সমাধান আলোচনা এ নিবন্ধে সম্ভব নয়। এমনিতেই লেখাটির পরিসর ভীতিকরভাবে বেড়ে গেছে। তবে এটুকু বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কখনোই কেবল সেতু, দালান ইত্যাদি নির্মাণ করা নয়, যদিও উন্নয়নের জন্যে এসব অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে বিশেষ একটি গোষ্ঠি বা শ্রেণীর উন্নয়নও নয়। তবে আমরা যখনি যাই করিনা কেন সামগ্রিক সামাজিক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (social cost-benefit analysis) করেই তা আমাদের করতে হবে। এদেশে আমরা এমন একটা গাড়ী বন্ধুর সড়কে চালাতে চাচ্ছি, যে গাড়ীর একটি চাকা হয়তো গোলাকার হলেও অপর তিনটির একটি আয়তাকার, একটি বর্গাকার ও অপরটি ত্রিভুজাকার।

উপসংহার

প্রকৃতিতে তিমি মাছের মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড়ো বলে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন- ভাগ্যিস তিমির দুটো হাত নেই, নইলে তিমিই হয়তো প্রকৃতিতে রাজত্ব করতো, এমনকি মানুষের উপরও। আমারদের অপরিসীম সম্ভাবনাকে সমস্যার পাহাড় সরিয়ে দিয়ে কাজে না লাগালে সেগুলো বরাবর সম্ভাবনাই থেকে যাবে, বাস্ত বে রুপ নেবেনা। সে জন্যে চাই অনিসন্ধিৎসু মন ও পরিবর্তনের সুতীব্র আকাঙ্খা, তারও আগে প্রয়োজন সার্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টি ও দূরদশী নেতৃত্ব। একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের জন্য ১ সপ্তাহ বা ১ মাসের প্রয়োজনের কথা পূর্বেই ভেবে রাখতে পারে। একটা পরিবার ভেবে রাখতে পারে ১ বা ২ বছরের ভবিষ্যত প্রয়োজনের কথা। কিন্তু একটা জাতি বা দেশকে ভেবে রাখতে হয় কমপক্ষে ৩০০ হতে ৫০০ বছরের ভবিষ্যত প্রয়োজনের কথ। বর্তমান সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের জন্যে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন তার প্রশংসা করেও বলতে হয়, এসবই যথেষ্ট নয়। কবি রবার্ট ফ্রষ্টের অনুসরণে তাই বলতে হয়, আমাদের "যেতে হবে বহুদুর, যেতে হবে বহু বহু দূর"।

তথ্য সূত্র

১. Chittagong Port Authority; Chittagong Port: An Overview; 2005.

২. Pacific Consultants International Nippon Koei Co. Ltd. (on behalf of Japan International Co-operation Agency (JICA) and Board of Investment, The People's Republic of Bangaldesh); The Study on Industrial Development of Chittagong Region in the People's Republic of Bangladesh (Progress Report II); December 1994.

৩. John W. Chanslor; Treasures from the Sea; Navigational Information Service Division, Defense Mapping Agency Hydrographic Center; Washington, D.C.

৪. সি রাজা মোহন (অনুবাদঃ মিজানুর রহমান-ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস হতে); কুটনীতি এখন মহাসড়কে; প্রথম আলো; ২৮ মার্চ ২০০৬ ।

৫. মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম; চট্টগ্রামের সমুদ্র সম্ভাবনা; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ ।

৬. চট্টগ্রাম কি আসলেই চলমান; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৭ ।

৭. চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ ।

৮. চট্টগ্রাম নিয়ে আসলে হচ্ছেটা কি? দৈনিক পূর্বকোণ; ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ।

৯. আপনি চট্টগ্রাম সর্ম্পকে কতটুকু জানেন? আলোকিত চট্টগ্রাম, প্রথম আলো; ২০ জানুয়ারী, ২০০০ ও ২৭ জানুয়ারী, ২০০০ ।